গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

সুপারিশসমূহ

১৫ জানুয়ারি ২০২৫

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকল আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের পর্যালোচনা এবং অংশীজনের সঙ্গে ব্যাপক মতবিনিময় ও আমাদের সর্বোচ্চ বিবেচনার ভিত্তিতে নিম্নের সুপারিশগুলো প্রণয়ন করেছি। আমরা কমিশনের সদস্যগণ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার এই কাজটি সম্পন্ন করেছি, যাতে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে যাঁরা আহত-নিহত হয়েছেন তাঁদের চরম আত্মত্যাগ বৃথা না যায়। যাঁরা কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়নে নানাভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১.০ নির্বাচন কমিশন

১.১ নির্বাচন কমিশন গঠন

নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটির উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং নাগরিক সমাজের অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান এবং কমিশনারদের দায়িত্ব, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করা। [বিকল্প: একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।]

১.২ নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা

(ক) নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন স্থগিত বা বাতিল এবং পুনর্নির্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করা।
(খ) নির্বাচন কমিশনের সচিব নিয়োগের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা।
(গ) নির্বাচনকালীন নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে নিবাহী বিভাগের পক্ষ থেকে এমন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নেওয়ার বিধান করা।
(ঘ) ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের মতো বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, লিখিতভাবে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শনপূর্বক, সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, ৯০ দিনের জন্য নির্বাচন স্থগিত করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে মতামত চাওয়ার বিধান করা।

১.২ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

(ক) জাতীয় নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, ফলাফল গেজেটে প্রকাশের পুর্বে, নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ঘোষণা প্রদানের বিধান করা।
(খ) নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো রাজনৈতিক দল সংক্ষুব্ধ হলে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে অভিযোগ করার সুযোগ সৃষ্টির বিধান করা। কমিশন/আদালত কর্তৃক সর্বোচ্চ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান করা।
(গ) স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পুরো দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে ন্যস্ত করা।
(ঘ) ভোটার শিক্ষা ও সচেতনতা এবং গবেষণা কার্যক্রমকে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। এসব কার্যক্রমে শিক্ষার্থী ও বেসরকারি সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করা।
(ঙ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 'ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
(চ) কমিশন কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনী ও পোলিং এজেন্টদের সুরক্ষা প্রদানের বিধান করা।
(ছ) আউয়াল কমিশন ২০২৩ সালে যেসব বিতর্কিত রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান করেছে, যথাযথ তদন্তসাপেক্ষে সেগুলোর নিবন্ধন বাতিল করা।

১.৩ নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা ও শাস্তি

(ক) নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের (যদি না হয়, তাহলে বিদ্যমান সংসদের অনুরূপ) সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।
(খ) নির্বাচন কমিশনের মেয়াদকালে কমিশনারদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগ উঠলে তা সংবিধানের ১১৮ ও ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে সুরাহা করার বিদ্যমান বিধান কার্যকর করা।
(গ) সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে এবং শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা।
(ঘ) আরপিও'র ৯০(ক) ধারা সংশোধনপূর্বক নির্বাচনী অপরাধের মামলা দায়েরের সময়সীমা রহিত করা।

১.৪ রিটার্নিং কর্মকর্তা/সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ

নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কমিশনের কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে প্রশাসনসহ অন্য ক্যাডার থেকে নিয়োগ করা।

১.৫ নির্বাচন কমিশনের ব্যয়

প্রশিক্ষণ ভাতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ম্যাজিস্ট্রেটদের ভাতার যথার্থতা ও পরিমাণ পর্যালোচনাপূর্বক পুনর্নির্ধারণ ও বাতিল করা। (উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন তথা সরকারের নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় ১৯৭৩ সালে ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা, যা ২০২৪ সালে এসে দাঁড়িয়েছে মোট ১ হাজার ৯২৭ কোটি টাকা।)

১.৬ নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি

(ক) একটি যৌথ সত্তা হিসেবে দৈনন্দিন রুটিন কার্যক্রম ব্যতীত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিসহ নির্বাচন কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কমিশনের সভায় গৃহীত হওয়ার বিধান করা।

(খ) নির্বাচন-সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম কমিশনের যৌথ সিদ্ধান্তে পরিচালিত করার বিধান করা।

১.৭ নির্বাচন কমিশনের জনবল

(ক) কমিশনের সচিবালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের অর্গানোগ্রাম ও জনবল কাঠমো একটি আন্তর্জাতিক অডিট ফার্মের মাধ্যমে নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের বর্তমানে ৫ হাজারের অধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে।)

(খ) একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি পৃথক সার্ভিস সৃষ্টির বিধান করা।

২.০ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

২.১ প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা

(ক) ঋণ-বিল খেলাপিদের প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখা।

(খ) কোনো আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসেবে ঘোষিত ব্যক্তিদের প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখা।

(গ) বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে আসীন ব্যক্তিদের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ওই পদ থেকে তিন বছর আগে অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আরপিও'র ধারা বাতিল করা।

(ঘ) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(২)(ঘ) এর অধীনে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে বিচারিক আদালতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার শুরু থেকেই সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা।

(ঙ) আইসিটি আইনে (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে) শাস্তিপ্রাপ্তদের সংসদ নির্বাচনে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার শুরু থেকেই সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা।

(চ) গুরুতর মানবাধিকার (বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, অমানবিক নির্যাতন, সাংবাদিকদের/মানবাধিকারকর্মী ওপর হামলা, ইত্যাদি) এবং গুরুতর দুর্নীতি, অর্থপাচারের অভিযোগে গুম কমিশন বা দুর্নীতি দমন কমিশন বা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হলে তাদেরকে সংবিধানের ৬৬(২)(ছ) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য করা। (সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি উচ্চতর হওয়া দরকার এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দরকার। এ ক্ষেত্রে 'ট্রানজিশান্যার জাস্টিসের' যুক্তিও উত্থাপন করা যেতে পারে।)

(ছ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদত্যাগ না করে সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা।

(জ) তরুণ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ মনোনয়নের সুযোগ তৈরির বিধান করা।

(ঝ) স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১% শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর জমা দেওয়ার বিধানের পরিবর্তে ৫০০ ভোটারের সম্মতির বিধান করা এবং এ ক্ষেত্রে একক কিংবা যৌথ হলফনামার মাধ্যমে ভোটারদের সম্মতি জ্ঞাপনের বিধান করা।

(ঞ) একাধিক আসনে কোনো ব্যক্তির প্রার্থীর হওয়ার বিধান বাতিল করা।

(ট) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের প্রেক্ষাপটে আপিল প্রক্রিয়ায় অনুচ্ছেদ ১২৫(গ) বহাল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ["১২৫(গ)। কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এরূপ কোনো নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনোরূপে কোনো আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।"]

(ঠ) হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার কিংবা তথ্য গোপনের কারণে আদালত কর্তৃক কোনো নির্বাচিত ব্যক্তির নির্বাচন বাতিল করা হলে ভবিষ্যতে তাঁকে নির্বাচনে অযোগ্য করার বিধান করা।

২.২ <u>মনোনয়পত্র</u>

(ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আইনি হেফাজতে থাকা ব্যতীত সকল প্রার্থীর সশরীরে মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তৈরি করা।

(খ) নির্বাচনী তফসিলে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় বৃদ্ধি করা, যাতে হলফনামা যাচাই-বাছাই করা ও আপিল নিষ্পত্তি জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়। অন্যদিকে নির্বাচনী প্রচারণার সময় কমানো, যাতে প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় সাশ্রয় হয়।

(গ) প্রার্থিতা চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করা। এ লক্ষ্যে আদালতের হস্তক্ষেপের বিষয়টি শুধু 'কোরাম নন জুডিস' ও 'ম্যালিস ইন ল'-এর ক্ষেত্রে সীমিত করা।

(ঘ) মনোনয়নপত্রের সঙ্গে ৫ বছরের আয়কর রির্টানের কপি জমা দেওয়ার বিধান করা।

(ঙ) নির্বাচনী তফসিলে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় বৃদ্ধি করা, যাতে হলফনামা যাচাই-বাছাই করা ও আপিল নিষ্পত্তি জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়। অন্যদিকে নির্বাচনী প্রচারণার সময় কমানো, যাতে প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় সাশ্রয় হয়।

২.৩ হলফনামা

(ক) প্রার্থী কর্তৃক মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রত্যেক দল তার প্রার্থীদের জন্য প্রত্যয়নপত্রের পরিবর্তে দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী ব্যক্তি কর্তৃক হলফনামা জমা দেয়ার বিধান করা, যাতে মনোনীত প্রার্থীর নামের পাশাপাশি মনোনয়ন বাণিজ্য না হওয়ার ও দলীয় প্যানেল থেকে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ থাকে।

(খ) পরবর্তী নির্বাচনের আগে যে কোনো সময় নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত ব্যক্তির হলফনামা যাচাই-বাছাই করতে এবং মিথ্যা তথ্য বা গোপন তথ্য পেলে তার নির্বাচন বাতিল করা।

২.৪ নির্বাচন ব্যবস্থা

(ক) নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিধান বাতিল করা।

(খ) নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় প্রতিরক্ষা বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা।

(গ) কোনো আসনে মোট ভোটারের ৪০% ভোট না পড়লে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

(ঘ) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন বন্ধ করা, রাজনৈতিক দলগুলোকে সৎ, যোগ্য এবং ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী দেওয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচনে 'না-ভোটে'র বিধান প্রবর্তন করা। নির্বাচনে না-ভোট বিজয়ী হলে সেই নির্বাচন বাতিল করা এবং পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাতিলকৃত নির্বাচনের কোনো প্রার্থী নতুন নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারার বিধান করা।

২.৫ নির্বাচনী ব্যয়

(ক) সংসদীয় আসনের ভোটার প্রতি ১০ টাকা হিসেবে নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারণের বিধান করা।

(খ) সকল নির্বাচনী ব্যয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা আর্থিক প্রযুক্তির (যেমন, বিকাশ, রকেট) মাধ্যমে পরিচালনা করা।

(গ) নির্বাচনী আসনভিত্তিক নির্বাচনী ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবিড়ভাবে নজরদারিত্ব করা।

(ঘ) প্রার্থী এবং দলের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাবের রিটার্নের নিরীক্ষা এবং হিসাবে অসঙ্গতির জন্য শাস্তির বিধান করা।

২.৬ নির্বাচনী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

(ক) বিদ্যমান 'নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি'কে অনুসন্ধান বা তদন্ত করার ক্ষমতা প্রদানের পাশাপাশি বিচার-নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করে 'নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক' কমিটি নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারিক সত্তা/বডি গঠন করা।

(খ) নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির আওতায় প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে সদস্য করা। এর প্রেক্ষিতে উক্ত কমিটিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ ধারা মতে বিচারার্থে অপরাধ আমলে নেওয়ার এবং সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা অর্পণ করা।

(গ) সংসদ নির্বাচন চলাকালে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটিগুলোর কার্যাবলি তদারকি করার নিমিত্তে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে একটি উচ্চ পর্যায়ের 'নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কার্যক্রম তদারকি কমিটি' একজন নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে গঠন করা।

(ঘ) কার্যকালীন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটিগুলো প্রশাসনিকভাবে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কার্যক্রম তদারকি কমিটির আওতায় আনা। বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এগুলোকে স্বাধীন করা।

(ঙ) হাইকোর্ট বিভাগে নির্বাচনি মামলার চাপ কমাতে এবং শুধু নির্বাচনি বিরোধ সংশ্লিষ্ট মামলা (ইলেকশন পিটিশন) দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জেলা পর্যায়ে 'সংসদীয় নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল' (Parliamentary Election Tribunal) স্থাপন এবং ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিলের সুযোগ রাখা।

২.৭ নির্বাচনী অপরাধ/কমিশনের অপরাধ

(ক) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ বা অনিয়ম আইনের আওতায় আনার জন্য প্রস্তাবিত নির্বাচন কমিশন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(খ) সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনপূর্বক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে মামলা করতে কমিশনের অনুমতির বিধান বহাল রাখলেও তদন্ত বা অনুসন্ধান করতে আইনগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

(গ) *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ এর ৯০ ধারায় ৭৩ ও ৭৪ ধারার অধীনে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা শিথিল করা।

(ঘ) নির্বাচনী অপরাধ বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা পরিহারের লক্ষ্যে নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করা। ফলে একদিকে যেমন দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে, অন্যদিকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।

(ঙ) ২০১৮ সালের জালিয়াতির নির্বাচনের দায় নিরুপণের জন্য একটি 'বিশেষ তদন্ত কমিশন' গঠন করা।

২.৮ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ/গণমাধ্যম

(ক) নিশ্চল (stationary) পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া, যাতে পর্যবেক্ষকরা সারাদিন কেন্দ্রে থাকতে পারে, কিন্তু ভোটকক্ষে সার্বক্ষণিকভাবে নয়।

(খ) নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাকে প্রাক্-নির্বাচনকালীন পর্যবেক্ষণের অফিসিয়াল অনুমতি প্রদান করা।

(গ) পক্ষপাতদুষ্ট ভুয়া পর্যবেক্ষক নিয়োগ বন্ধ করা।

(ঘ) ব্যক্তি পর্যায়ে পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিধান চালু করা।

(ঙ) পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ভবিষ্যতে নির্বাচন ভালো করার জন্য কাজে লাগানোর বিধান করা।

(চ) আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপগুলো সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থার জন্য সুস্পষ্ট করা। সরকারের পরিবর্তে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া।
(ছ) নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বৈধ কার্ডধারী সাংবাদিকদেরকে সরাসরি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ, অনিয়মের চিত্র ধারণ, নির্বাচনের দিনে মোটর সাইকেল ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা।

২.৯ নির্বাচনী আচরণবিধি
(ক) ব্যানার, তোরণ ও পোস্টারের পরিবর্তে লিফলেট, ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সরকারি গণমাধ্যমে প্রচারের সম-সুযোগ প্রদানের বিধান করা।
(খ) *সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪* মেনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণার বিধান করা।
(গ) ১৯৯০ সালের তিনজোটের রূপরেখার মতো রাজনৈতিক দলের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা।

৩.০ প্রধানমন্ত্রী

(ক) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা।
(খ) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।
(গ) একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা।

৪.০ সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন

(ক) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) আসন বণ্টন করা।
(খ) উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০% দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।
(গ) সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।
(ঘ) অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।
(ঙ) বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া।

৫.০ সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব

(ক) সংসদের (নিম্ন কক্ষ) আসন সংখ্যা ১০০ বাড়িয়ে মোট সংখ্যা ৪০০ করা। এই ৪০০ আসনের মধ্যে নারীদের জন্য নির্ধারিত ১০০ আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিধান করা, যাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আসন থেকে নারীদের সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং দ্বৈত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ বন্ধ হয়।

৬.০ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

(ক) দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।
(খ) জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।

৭.০ কার্যকর সংসদ

৭.১ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংসদ সদস্যদের প্রত্যাহারের (recall) বিধান করা।

৭.২ সংসদ সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা
(ক) সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি, আবাসিক প্লট, সকল ধরনের প্রটোকল ও ভাতা পর্যালোচনা ও সংশোধন করা]।
(খ) একটি 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের বাৎসরিকভাবে সম্পদের হিসাব প্রদান এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বের বিষয়সমূহ ঘোষণা করা।
(গ) সংবিধান লঙ্ঘন করে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়নে জড়িত থাকার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের *আনোয়ার হোসেন বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায় কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা এবং ভবিষ্যতে সংসদ সদস্যদেরকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টার পদ থেকে অপসারণ করা।
(ঘ) সংসদ সদস্যদের জন্য বিশেষ প্রটোকলের অবসান করা।

৭.৩ বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া।

৮.০ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা

(ক) প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন সম্পন্ন করা।
(খ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের বিধান করা।
(গ) স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা।

৯.০ স্থানীয় সরকার নির্বাচন

(ক) একটি স্থায়ী 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন করা। (এ লক্ষ্যে ২০০৭ সালে গঠিত 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালী ও গতিশীলকরণ কমিটি'র আলোকে একটি আইন প্রণয়ন করা। প্রসঙ্গত, বর্তমান কমিশনের প্রধান 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালী ও গতিশীলকরণ কমিটি' একজন সদস্য ছিলেন।
(খ) জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।
(গ) স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় করার জন্য আইন সংশোধন করা।
(ঘ) সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের এবং মেম্বার/কাউন্সিলরদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থবহ ভূমিকা নিশ্চিত করার বিধান করা।
(ঙ) স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান করা।
(চ) এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে শপথ গ্রহণের পূর্বে শিক্ষকের পদ থেকে পদত্যাগের বিধান করা।
(ছ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদপ্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে ভোটারদের জানার অধিকার নিশ্চিত করা।
(জ) পার্বত্য এলাকার জেলা পরিষদের নির্বাচনের আয়োজন করা।
(ঝ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বাজেটের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার বিধান করা।

১০.০ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

(ক) নতুন দল নিবন্ধনের শর্ত শিথিলের লক্ষ্যে ১০% জেলা এবং ৫% উপজেলা/থানায় দলের অফিস এবং ন্যূনতম ৫,০০০ সদস্য থাকার বিধান করা।
(খ) দলের সাধারণ সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং উক্ত তালিকা প্রতিবছর একবার হালনাগাদ করা।
(গ) আইসিটি আইনে সাজাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে কোনো দলের সাধারণ সদস্য/কমিটির সদস্য হওয়ার অযোগ্য করা।
(ঘ) গুরুতর মানবাধিকার (বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, অমানবিক নির্যাতন, সাংবাদিকদের/মানবাধিকারকর্মীর ওপর হামলা, অর্থ পাচার) লঙ্ঘনকারীদের বিষয়ে প্রণীত একটি বিশেষ আইনের অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইসিটি আইনে সৃষ্ট আদালতে অভিযোগপত্র গৃহীত হলে সে সব ব্যক্তিদেরকে কোনো দলের সাধারণ সদস্য/কমিটির সদস্য হওয়ার অযোগ্য করা।
(ঙ) দলের সাধারণ সদস্যদের গোপন ভোটে দলের স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল কমিটি নির্বাচিত করা।
(চ) দলের সাধারণ সদস্যদের গোপন ভোটে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তিনজনের একটি প্যানেল তৈরি এবং তা থেকে দলীয় মনোনয়ন প্রদানের বিধান করা।
(ছ) দলের সদস্যদের চাঁদা ন্যূনতম ১০০ টাকা ও কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান হিসেবে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা নেওয়ার বিধান করা। এ অনুদান ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ট্যাক্স রিটার্নে প্রদর্শনের বিধান করা।
(জ) দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে বিদ্যমান ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নিবন্ধিত দল কর্তৃক বাৎসরিকভাবে দাখিলকৃত অডিটেড আয় ও ব্যয়ের হিসাব কমিশন কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে নিরীক্ষণের বিধান করা।
(ঝ) দলের লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র, শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠন, ভাতৃপ্রতিম বা যে কোনো নামেই হউক না কেন, না থাকার বিধান করা।
(ঞ) দলের, যে কোনো নামেই হউক না কেন, বিদেশি শাখা না থাকার বিধান করা।
(ট) দলের সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের জন্য দলের তিন বছরের সদস্য পদ থাকা বাধ্যতামূলক করা।
(ঠ) প্রতি ৫ বছর পর পর দল নিবন্ধন নবায়ন বাধ্যতামূলক করা।
(ড) পর পর দুটি নির্বাচনে অংশ না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিলের বিধান বাতিল করা।

১১.০ সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

(ক) সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত আন্তর্জাতিক অনুসরণীয় নীতিমালার আলোকে সংস্কার কমিশন প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা।
(খ) ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।

১২.০ জাতীয় পরিচয়পত্র

১২.১ জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা

(ক) *জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন ২০২৩* – যার মাধ্যমে এনআইডি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে – জরুরি ভিত্তিতে বাতিল করা।
(খ) *জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন-২০১০* কে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে পুনর্বহাল করা, যাতে এটি নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত আধুনিক আইডেন্টিটি সিস্টেমকে আইনি ভিত্তি দিতে পারে এবং যার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক তার আইডেন্টিটি তথ্যের মালিকানা এবং তার সকল আইডেন্টিটি তথ্যের উপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেতে পারেন।
(গ) জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত বিদ্যমান স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) পর্যালোচনা করে সকল অব্যবস্থাপনা, হয়রানি ও অনিয়মের অবসান ঘটিয়ে এ কার্যক্রমকে জনবান্ধব করা।
(ঘ) ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল নাগরিককে হালনাগাদ ছবিযুক্ত এনআইডি স্মার্টকার্ড প্রদানের লক্ষ্যে এখনই প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করা, যাতে ভোটার শনাক্তকরণে এটি ব্যবহার করা যায়।
(ঙ) বাংলাদেশের প্রায় সকল গণমাধ্যমে লাখ লাখ বাংলাদেশি নাগরিকের এনআইডি তথ্য ফাঁস হওয়া এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও ম্যাসেজিং প্ল্যাটফর্ম থেকে নামমাত্র মূল্যে বা এমনকি বিনামূল্যে এই তথ্যগুলো ফাঁসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে, এই দাবিগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁসের অন্তর্নিহিত কারণ, প্রভাব এবং পরিণতি নির্ধারণ করতে স্বাধীন তদন্তের ব্যবস্থা করা এবং দোষী ব্যক্তিদের প্রচলিত আইনে শাস্তির ব্যবস্থা করা।
(চ) বর্তমানের ১৬ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী বাংলাদেশি নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের পাশাপাশি ভবিষ্যতে ১০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী শিশুদের জন্য পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
(ছ) সারাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনআইডি সংক্রান্ত সকল সেবা সুচারুরূপে সম্পন্নের নিমিত্তে দেশের বৃহত্তম জাতীয় তথ্য ভাণ্ডারের নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন, আপগ্রেডেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিবর্তে 'জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন সংস্থা' নামে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠন করা, যার দায়িত্ব হবে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও বিতরণ। এই সংস্থার অর্গানোগ্রাম ও জনবল কাঠমো নির্ণয়ে একটি আন্তর্জাতিক অডিট ফার্মের মাধ্যমে নিরীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
(জ) বর্তমানে পরিচালিত সম্পূর্ণ এনআইডি সিস্টেমকে তথা সংশ্লিষ্ট ডাটা সেন্টার, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার/ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, ডাটাবেস, ক্রেডেনশিয়ালস্ (Credentials) ইত্যাদি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন সংস্থার নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। প্রস্তাবিত আধুনিক আইডেন্টিটি সিস্টেমের জন্য একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২.২ আইডেন্টিটি এবং আইডেন্টিটি সিস্টেম

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্রকে ডিজিটাল (ভার্চুয়াল) ভার্সনে রূপান্তরের ব্যবস্থা করা। রিপোর্টে প্রস্তাবিত Self-sovereign Identity (SSI)-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের বিদ্যমান এনআইডি কার্ডকে একটি স্ট্যান্ডার্ডাইজ্ড ডিজিটাল ফরম্যাটে কার্যকরভাবে রূপান্তর করা। এই লক্ষ্যে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে বর্তমান এনআইডি সিস্টেমকে একটি পূর্ণাঙ্গ SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেমে রূপান্তর করা।
(খ) প্রস্তাবিত SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেম বাস্তবায়নের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ্ড SSI প্রযুক্তি স্ট্যাক ব্যবহার করে প্রস্তাবিত আইডেন্টিটি সিস্টেম ডিজাইন ও ডেভেলাপ করা। একইসঙ্গে প্রয়োজনীয় ট্রাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক, Governance ফ্রেমওয়ার্ক এবং আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা এবং অ্যাপ্লিকেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা।
(গ) SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেমের অনুষঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের স্মার্টফোনের জন্য একটি SSI ওয়ালেট ডেভেলপ করা। এই ওয়ালেটটি ডিজাইন এবং ডেভেলপের সময় এর সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তবে যাদের স্মার্টফোন নেই তাদের জন্য ফিচার ফোনভিত্তিক একটি সমাধান ডেভেলপ করা।
(ঘ) প্রস্তাবিত সিস্টেম এবং এর বিভিন্ন সাব-কম্পোনেন্ট ও SSI ওয়ালেটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নিরাপত্তা নিরীক্ষা (সিকিউরিটি অডিট) প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে সিকিউরিটি অডিট পরিচালনা করা।
(ঙ) SSI-ভিত্তিক এই সমাধান প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পরে বিদ্যমান সরকারি এবং বেসরকারি অনলাইন পরিষেবাগুলো রূপান্তরের ব্যবস্থা করা, যাতে এই সিস্টেমের সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি ফিচারগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এর জন্য আন্তর্জাতিক বেস্ট প্র্যাক্টিসগুলো অনুসরণ করে একটি পরিচয় প্রমিতকরণ (identity standardization) ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা, যাতে দেশের মধ্যে এবং বিশ্বব্যাপী অন্যান্য দেশের সঙ্গে এনআইডি সিস্টেমের আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা (interoperability) নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
(চ) প্রস্তাবিত সিস্টেমটি ডেভেলপ করার পরে এটিকে rigorously টেস্ট করা। বিশেষ করে প্রস্তাবিত সিস্টেমটিতে অনেকগুলো জটিল এবং পরস্পর সংযুক্ত সাব-কম্পোনেন্ট রয়েছে সেগুলোকেও পৃথকভাবে টেস্ট করা।

(ছ) এরূপ একটি কমপ্রিহেনসিভ জাতীয় পরিচয় ব্যবস্থার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা (personal data protection and privacy) আইন প্রণয়ন করা। এই আইন দেশের মধ্যে পরিচয় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত যেকোনো ভবিষ্যৎ অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে।

১৩.০ প্রবাসীদের ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ

(ক) সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের যতদ্রুত সম্ভব ভোটার তালিকায় এবং এনআইডি সার্ভারে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা। নিবন্ধনের সময় তাঁদের বায়োমেট্রিক তথ্য এবং সাম্প্রতিক ছবি যেন হালনাগাদ করা থাকে এটা নিশ্চিত করা। বর্তমানে প্রচলিত প্রক্রিয়াতে প্রবাসীদের নিবন্ধন করতে যেহেতু অনেক সময় লাগে, এটি আরও অপটিমাইজ করে পুরো প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য কার্যকর কৌশল বের করা। যেহেতু সকল বাংলাদেশি প্রবাসীর পাসপোর্ট রয়েছে, তাই পাসপোর্ট ডাটাবেসে সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহার করে নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুততর সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা।
(খ) ডিসেম্বর ২০২৫ এ আগামী জাতীয় নির্বাচন হবার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর ২০২৫ এর মধ্যে যেসকল প্রবাসীর ভোটার তালিকায় এবং এনআইডি সার্ভারে নিবন্ধন করা সম্ভব হবে, তাদেরকে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে প্রস্তাবিত পোস্টাল ভোটিং পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

১৪.০ ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ

(ক) বাড়ি বাড়ি গিয়ে সামগ্রিক ভোটার তালিকা যাচাই ও হালনাগাদের মাধ্যমে 'জেন্ডার গ্যাপ'-সহ অন্যান্য অসংগতির অবসান ঘটানো।
(খ) ভোটার তালিকা আইন সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগে যাদের ১৮ বছর পূর্ণ হবে তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।

১৫.০ প্রবাসী পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা

(ক) প্রবাসীদের জন্য একটি তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার প্রস্তাব করছি, যার মাধ্যমে প্রবাসীদের পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে এই লক্ষ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত দুটি সমাধান প্রস্তাব করছি। প্রবাসীদের ভোটদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ হবে দুটি সমাধানের মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা।
(খ) প্রস্তাবিত তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার বাস্তবায়নকল্পে দুইটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন – ভোটার অ্যাপ এবং ভেরিফায়ার অ্যাপ – যথাযথ ফাংশনালিটিসহ ডেভেলপ করা। এক্সেসেবিলিটি বাড়ানোর জন্য এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্য ডেভেলপ করা। এছাড়াও প্রস্তাবিত পদ্ধতির জন্য একটি ব্যাকএন্ড সিস্টেম ডেভেলপ করা।
(গ) ডেভেলপকৃত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলো এবং সিস্টেমের সিকিউরিটি নিশ্চিত করা, যাতে তথ্য সিকিউরলি আদান প্রদান এবং ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা করা যায়। এর সঙ্গে একটি এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম এবং immutable অডিট ট্রেলের মাধ্যমে ডাটাবেসের সিকিউরিটি নিশ্চিত করা।
(ঘ) জাতীয় নির্বাচনে প্রস্তাবিত সিস্টেমকে ব্যবহারের আগে এটির ব্যাপক পরীক্ষা/নিরীক্ষার প্রয়োজন। এজন্য আমরা কমপক্ষে তিন-পর্যায়ের ট্রায়ালের পক্ষে সুপারিশ করছি[১]। এই তিন-পর্যায়ের ট্রায়াল প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে যেকোনো অস্বাভাবিকতা শনাক্ত এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবে, যা জাতীয় নির্বাচনে সিস্টেমটি ব্যবহারের পথকে সুগম করবে।
(ঙ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক বা ততোধিক সিকিউরিটি অডিট ফার্ম দ্বারা ডেভেলপকৃত সিস্টেমটির ক্রমাগত নিরাপত্তা অডিট (Security Audit) করা। ডেভেলপকৃত সিস্টেমের ওপরে আস্থা স্থাপনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।
(চ) উপরোক্ত নতুন সিস্টেম যাতে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
(ছ) প্রস্তাবিত তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় সেই সব ভোটারদের বিবেচনা করা যারা এমন সব দেশে বসবাস করেন যেখানে বাংলাদেশের কোনো কনস্যুলেট নেই। এই দেশগুলোর জন্য কোনো কনস্যুলেট কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে তা নির্ধারণের জন্য একটি পলিসি প্রণয়ন করা।
(জ) কনস্যুলেট কর্মকর্তাদের প্রবাসী ভোটারদের কাছে পোস্টাল প্যাকেজ বিতরণের লজিস্টিক সংক্রান্ত কাজ কমানোর লক্ষ্যে প্রতিটি পোস্টাল প্যাকেজ বাংলাদেশে প্রস্তুত করে কনস্যুলেটগুলোতে বিতরণ করার জন্য আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশ করছি। কনস্যুলেটের কর্মকর্তাগণ তাদের কাছে পাঠানো পোস্টাল প্যাকেজ সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্টাল সার্ভিস ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট প্রবাসী ভোটারদের কাছে বিতরণ করবেন।
(ঝ) পোস্টাল ভোটিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সমস্ত কার্যক্রম (নিবন্ধন থেকে শুরু করে সব নির্বাচনী এলাকার ট্রেজারিতে পোস্টাল ব্যালট বক্স নিরাপত্তার সঙ্গে সংরক্ষণ করা পর্যন্ত) সম্পন্ন করার জন্য একটি কার্যকর সময়কাল নির্ধারণ করা।

---

[১] প্রাথমিক পর্যায়ে সিস্টেমটি একটি দেশে ট্রায়াল করা উচিত, যেখানে প্রায় ৫০ থেকে ১০০ জন প্রবাসী ভোটার অংশগ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে এটি পাঁচ থেকে দশটি দেশে ১,০০০ থেকে ৫,০০০ প্রবাসী ভোটারদের মধ্যে এবং শেষ পর্যায়ে সিস্টেমটি যত বেশি সম্ভব দেশে ২০,০০০ বা তার বেশি প্রবাসী ভোটারদের মধ্যে ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঞ) প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি প্রবাসী ভোটারদের মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে, তবে সিস্টেমের কার্যপ্রণালীতে অল্প কিছু পরিবর্তন করে এটি দেশের অভ্যন্তরে অনুপস্থিত ভোটারদের জন্যও সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে আমাদের ডাক বিভাগের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে যেহেতু সন্দেহ আছে, তাই এই ক্ষেত্রে একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের কাছে নির্ভরযোগ্যভাবে পোস্টাল প্যাকেজ পাঠানো এবং পরবর্তীতে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পোস্টাল ব্যালট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য পোস্টাল প্যাকেজ ট্র্যাক করা যায় এরকম কোনো কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৬.০ অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থা

(ক) রিপোর্টে প্রস্তাবিত অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হবে ব্লকচেইন, সিকিউরিটি, ক্রিপ্টোগ্রাফি, প্রাইভেসি-বর্ধনকারী (privacy-enhancing) প্রযুক্তি এবং অনলাইন ভোটিংয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি প্রযুক্তিগত টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা করা। এই টাস্কফোর্সে নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সরকারি মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার প্রাসঙ্গিক ডোমেইন বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা।
(খ) গঠিত এই টাস্কফোর্সের প্রথম দায়িত্ব হবে সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্টের আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের আর্কিটেকচার ও প্রোটোকল ডিজাইন এবং সিস্টেমটির ডেভেলপমেন্ট তত্ত্বাবধান করা[২]।
(গ) সিস্টেমটি তৈরি হয়ে গেলে এর কার্যকারিতা (Functionalities), নিরাপত্তা (Security) এবং ব্যবহারযোগ্যতা (Usability) নিশ্চিত করার জন্য এটিকে যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।
(ঘ) পরবর্তীতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক সিকিউরিটি অডিট ফার্ম দ্বারা সিস্টেমটির ক্রমাগত নিরাপত্তা অডিট (Security Audit) করা। ডেভেলপকৃত সিস্টেমের ওপরে আস্থা স্থাপনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।
(ঙ) ডেভেলপকৃত সিস্টেমে আস্থা স্থাপনের আরেকটি প্রচলিত পদ্ধতি হলো এর কোডবেসটি প্রকাশ করা, যাতে বিশ্বের যে কেউ এর কোডবেস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। আরেকটি পরিপূরক পদ্ধতি হলো পাবলিক পেনেট্রেশন টেস্টিং এবং বাগ বাউন্টি প্রোগ্রাম চালু করা, যা সিস্টেমের গুরুতর সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসির দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে।
(চ) একটি সিকিউর অনলাইন ভোটিং সিস্টেম চালু করতে হলে দেশের আইনি কাঠামোতে সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। টাস্কফোর্সের প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি হবে দেশের বিভিন্ন আইনি কাঠামো বিশ্লেষণ করে কোন কোন জায়গায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা দরকার তা প্রস্তাব করা।
(ছ) জনগণের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে জনগণকে ক্রমাগতভাবে অনলাইন ভোটিং সিস্টেমটি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যে প্রথমে ছোট পরিসরের কোনো ভোটিংয়ে এই সিস্টেমটির ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা, যাতে ধীরে ধীরে সিস্টেমটির প্রতি জনগণের আস্থা গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই ট্রায়ালগুলোর সাফল্যের অভিজ্ঞতা ব্যাপক আকারে ব্যবহারের আদর্শ উদ্দীপক (ideal catalyst) হিসেবে কাজ করতে পারে।
(জ) এরূপ একটি সিস্টেম ডিজাইন করার সময় আমাদের অবশ্যই সেসব ভোটারদের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত যাঁদের স্মার্টফোন নেই। এই গোষ্ঠীর ভোটারদের জন্য আমাদের একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে তাঁরা বিকল্প পদ্ধতিতে অনলাইনে ভোট দিতে পারেন।

[২] এ লক্ষ্যে একাধিক বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, সফ্টওয়্যার ভেন্ডর এবং সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে একটি যৌথ প্রকল্প শুরু করা যেতে পারে, যা দেশের অভ্যন্তরে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। প্রয়োজনে অন্যান্য দেশ যারা অ্যাডভান্সড অনলাইন ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করছে তাদেরকে আন্তর্জাতিক অংশীদার হিসেবে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা।